১২

সংবাদ

তারিখ ····2 JAN 2012···
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

'ঝরে পড়া' রোধে নারী শিক্ষা কার্যক্রম : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

❖ আফরোজা বেগম রীটা

দশ বছরের মেয়ে রোমেনা ছোটবেলায় তার বাবাকে হারিয়েছে। মায়ের সঙ্গে মালিবাগের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে কাজ করে এবং সেখানেই বসবাস করে। গত চার বছর আগে গৃহকর্ত্রী তাকে টিসিএর হেলথ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বড় মগবাজারের একটি এনজিওবেইজড প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পথশিশু বা ছিন্নমূল শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রোমেনা সেখানে নিয়মিত দুই ঘণ্টার জন্য পড়াশোনা করতে যায়। কিন্তু পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবসরের অভাবে খুব একটা এগুতে পারছে না। গত চার বছর ধরে একই পড়া পড়ছে। সেখানে শিক্ষক কম এবং মনিটরিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুল ড্রেস, দুপুরের খাবার, শিক্ষা সরঞ্জামও প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করে। রোমেনার লেখাপড়া মন্দের ভালো চলছিল। ইদানীং রোমেনা শুনছে গৃহকর্ত্রী স্থায়ীভাবে বিদেশে চলে যাবেন। তাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই। কোথায় কাজ নেবে তারও নিশ্চয়তা নেই, হয়তো পড়াশোনা বন্ধই হয়ে যাবে রোমানার। Drop out-এর শিকার হবে সে। বর্তমানে আমাদের দেশে Drop out-এর হার ৩৫ শতাংশ। এর মধ্যে অধিকাংশই মেয়ে শিশু। কিন্তু রোমেনাদের মতো মেয়েরা জানে না শিক্ষা পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সমাজের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম যে ২২টি রাষ্ট্র শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। তাই ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য আবশ্যকীয় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে করা হয়েছে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার। এছাড়া, রয়েছে কমিউনিটি স্কুল, বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল, কিনডার গার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি। দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৬১ ভাগ সরকারি স্কুলে এবং ২৪ ভাগ সরকারি পাঠ্যধারায় পড়ালেখা করছে। সমস্যা হচ্ছে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলো সক্রিয় নয় এবং অভিভাবক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও না থাকার ফলে তা শিক্ষা ক্ষেত্রে ভয়ানক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। তবে আশার কথা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা ও বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গত ১১ মার্চ, ২০১২ তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল-২০১২' সংসদে পাস হয়েছে। এর ফলে দেশের যেসব দরিদ্র ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে না পেরে ঝরে পড়ছে বা যাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে ট্রাস্টের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলা মাধ্যমের স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থাও নেয়া হবে। তবে এই বিলের যথাযথ বাস্তবায়ন তখনই হবে যখন পুরুষ ও নারীর শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে। কারণ এখনও গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোতে কন্যাশিশুর শিক্ষা অর্জনের পথে যথেষ্ট বাধা রয়েছে। আর্থিক কারণে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বন্ধের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানের ভাগ্যেই তা প্রথমে জুটে। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করে সবার জন্য শিক্ষা সহজলভ্য করে দেয়ার বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার ব্যবস্থা নেয়া আও প্রয়োজন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নারী শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-২০০০ এই দুটি কার্যক্রমের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। কারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষায় যতগুলো ছেলে শিক্ষার্থী ততগুলো মেয়ে শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। বিশ্বব্যাপী যে ৭১৫ মিলিয়ন শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তির বাইরে রয়েছে তাদের মধ্যে ৬০ ভাগ হচ্ছে কন্যাশিশু। বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসরতা বৃদ্ধি পেলেও এখনও প্রধান অন্তরায় লিঙ্গ বৈষম্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার কারণে আমাদের দেশে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য শুরু হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোতে এখনও কন্যাশিশুর পেছনে বিনিয়োগ করা মানে অর্থের অপচয়। কারণ বিয়ের পর সে অন্য পরিবারে চলে যায় এমন ধারণা পোষণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে স্কুলে গিয়ে বিদ্যাচর্চা করা মেয়েদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো। এছাড়া, অনিরাপদ চলাচল ক্ষেত্র, যৌন হয়রানি, দারিদ্র্য ও বাল্যবিয়ের প্রতিবন্ধকতা নারী শিক্ষার অধিকার হরণ করে। তবে প্রতিকূলতার মাঝেও এদেশে ক্রমেই নারী শিক্ষার প্রসার ঘটছে। ১৯৯১ সালে যেখানে কেবলমাত্র ২০ ভাগ মহিলা পড়তে ও লিখতে পারত, বর্তমানে ৫০ ভাগের বেশি মেয়ে শিশু মাধ্যমিক স্কুলে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশু ভর্তিতে বাংলাদেশ হচ্ছে অগ্রপথিক। ২০১৫ সালের মধ্যে সব দেশে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য UNICEF ও UNGI একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। নারী শিশু শিক্ষার আন্দোলনে UNICEF-এর ক্যাম্পেইন বা সাময়িক অভিযানগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও মিনা কার্টুনের প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা অন্যতম। UNICEF এদেশের শিশু, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, জনপ্রিয় ফুটবলার, ক্রিকেটার, গায়ক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সঙ্গে একযোগে কাজ করার ফলে সামাজিক বাধা-বিপত্তি অনেকাংশে দূর হয়েছে এবং শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান প্রধান অংশীদারদের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে– বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়ে শিশুর জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়ন ইত্যাদি। এর ফলে প্রাথমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বিশেষত নিম্ন আয়ের লোকদের ক্ষেত্রে মেয়ে শিশু ভর্তির হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা ভালোভাবে শেষ করার হার বিশ্বের উন্নয়নশীল অনেক দেশের মেয়েদের তুলনায় বাংলাদেশে এখনও কম। ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ঝরেপড়া (Drop out), বাল্যবিয়ে, দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, এসিড সন্ত্রাস, অপুষ্টি, লিঙ্গ বৈষম্য, কুসংস্কার, ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতা দূর করা জরুরি। এ জন্য জাতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ কৌশল ও নীতি নির্ধারণপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল ২০১২-এর আওতায় যারা পড়বে তারা যেন কোন জটিলতা ছাড়াই সুবিধা ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, জাতির মেরুদণ্ড মজবুত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতাও দূর করার কথা ভাবতে হবে আন্তরিকভাবে। তবেই দেশ একদিন অর্জন করবে নারীদের শতভাগ শিক্ষার্জন।